শাহাদত চৌধুরী...

আফলাতুন হায়দার চৌধুরী

পাওয়ার অব পজিটিভ থিংকিং বইটি কবে যেন পড়েছিলাম। ইতিবাচক মানসিকতা যার আছে তার ভাবনা, স্বপ্ন, কল্পনা, পরিকল্পনা, কর্ম, সৃষ্টি- সবকিছুতে পজিটিভিটি থাকে। আর এই পজিটিভ মানসিকতা থাকলে যেকোনো কর্মযজ্ঞ থেকে গ্রহণযোগ্য, ইতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে আসে। পজিটিভ মানসিকতার বড় অভাব আমাদের সমাজে। যেকোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভালোটা আগে দেখা একটা আর্ট, উদারতা। এটা মহৎ গুণ। শাহাদত চৌধুরী ছিলেন তেমনই একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব।

ছোট একটা টেক্সট ম্যাসেজ- Shahadat Chowdhury's no more (inna...razeun)- KIRIN NYC. সঙ্গে সঙ্গে আকবর হায়দার কিরণকে কলব্যাক করলাম। তিনি এতোই কাঁদছিলেন, ঠিকমতো কথা বলতে পারছিলেন না। মুহূর্তে একটা শূন্যতা পেয়ে বসলো যেন। সেকেন্ডের মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেললাম। সবার আগে মনে পড়লো ২০০৩-এর গ্রীষ্মের সেই সময়টি। তার প্রসারিত দুহাত। হিথ্রো এয়ারপোর্টে ফোবানার প্রোগ্রাম থেকে লন্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার পথে চার নাম্বার টার্মিনালের ডিপার্চার লাউঞ্জে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গন বললে ভুল হবে, বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন কয়েক মুহূর্ত, 'ফোন করো, কেমন?' সদাহাস্য, আন্তরিক, অনেক ভালোবাসায় ভরা মানুষটির সঙ্গে আর দেখা হবে না- এটা ঠিক ভাবতে পারছিলাম না।

বাংলাদেশ নামের একটি দেশের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেলো সেই সঙ্গে।

অনেক ব্যস্ত এই মানুষটিকে খুব কাছ থেকে দেখার, তার সঙ্গে মেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান আমি। তিনি বলেছিলেন, 'লেখার চেষ্টা কর। বিদেশে থাকো, অনেক উপকরণ আছে লেখার।' সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিতেন, 'যেমন লন্ডন, অনেক বাঙালির বসবাস বহু বছর ধরে। তাদের নিয়ে লেখো। কিন্তু পজিটিভটা লিখবা। মনে রাখবা, সবকিছুতে ভালোটা বেশি থাকে। আমরা শুধু মন্দটা আগে দেখি।' হাসতে হাসতে পুরনো একটা ফ্রেঞ্চ প্রবাদ বললেন, 'ট্রেন একবার লেট করলে দোষ হয়, সব সময় যে সঠিক সময়ে চলেছে, সেটা কেউ দেখে না।'

'কি না করছে ব্রিটেনের বাঙালি শ্রেণী? ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভালো রেজাল্ট করছে। স্রেফ রেস্টুরেন্ট নয়, গাড়ির ব্যবসা করছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খুলছে, প্রাইভেট টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, প্রেস/পাবলিকেশন্স- এমনকি লিডারশিপ নিচ্ছে। ঐসব নিয়ে লিখবে। খারাপ-ভালো সবখানে আছে, কিন্তু ভালোটা নিয়ে লেখা, উৎসাহ দেয়া, জরুরি।' এমন একটা মানুষ, যার সঙ্গে কথা বলার সময় দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি মমতা, স্নেহ, দায়িত্ববোধ- এসব লক্ষ্য করা যায়। সেন্ট্রাল লন্ডনের লিস্টার স্কয়ারে বেঞ্চে বসে গল্প করছিলাম একবার, আমি আর শাহাদত মামা। সে বছর থার্টিফার্স্ট করতে মিলান আর নিউ ইয়ার করার জন্যে প্যারিস গিয়েছিলাম ট্রেনে চেপে। মিলান থেকে প্যারিস ফেরার পথে এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। তিনি কীভাবে ঢাকা থেকে তিউনিশিয়া ফ্লাইটে, তারপর তিউনিশিয়া থেকে গ্রিসে (পিরাইউস পোর্ট) কার্গো জাহাজে এবং সেখান থেকে বড় ট্রাকলরির ভেতরের অন্ধকার বাক্সে করে ইটালি এলেন সেটা বলছিলেন আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলেন। আমি সান্ত্বনা দেবো কী! নিজেও শিউরে উঠছিলাম অবর্ণনীয় কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে। স্রেফ দালালের কথায় লোভে পড়ে মানুষ নয়-দশ লাখ টাকা খরচ করে অবৈধভাবে বিদেশে আসে? শাহাদত মামা হাসলেন, 'দেখো, এতো কষ্ট করে বিদেশে যাচ্ছে মানুষ। সেখানে গিয়ে আরো বেশি কষ্ট করছে। কষ্টের উপার্জিত টাকা থেকে যতখানি সম্ভব দেশে পাঠাচ্ছে, পরিবারকে দিচ্ছে। এই অর্থ তার পরিবারের, সেই সঙ্গে দেশের কাজে আসছে। এ যে শেকড়ের প্রতি টান, এটা আমাদের প্রতিটি প্রবাসী বাংলাদেশীর আছে। তারা যখন দেখে তার পাঠানো টাকা দিয়ে তার পরিবার একটু ভালো, আনন্দে আছে, তখন ঐ কষ্ট আর মনে থাকে না।' শাহাদত মামার ঐ কথা শুনে আমার মন ভরে গিয়েছিলো। পৃথিবীর যতগুলো দেশে বাংলাদেশীরা আছেন, তারা মনে-প্রাণে দেশের কথা ভাবেন, উন্নত একটা বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন- এটা আমি নিজ চোখে দেখেছি। দূরপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, নর্থ-সাউথ আমেরিকা সবখানে। সেদিন নতুন করে উপলব্ধি করলাম। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ সব সময় প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্রা কিংবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রত্যেক সংখ্যায়, প্রবাসীদের পাঠানো সব ধরনের লেখা প্রকাশের মাধ্যমে।

'আমার কাছে নর্থ আমেরিকার চেয়ে ইউরোপ বেশি ভালো লাগে। এখানে সবখানে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের নিদর্শন।' কোভেন্ট গার্ডেনের একটা রেস্টুরেন্টের বাইরের অংশে গান শুনতে শুনতে খাচ্ছিলেন আর আমার সঙ্গে মৃদুস্বরে গল্প করছিলেন। এক কোণে একটি মেয়ে খুব দরদ দিয়ে অপেরা সিঙ্গারদের মতো চিকন শব্দের সুর তুলে যে টিউনটি তুলেছিলো সেটা এয়ারিয়া- শাহাদত মামা জানালেন।

তিনি সেদিন মেডিটেরানিয়ান খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। হুমাজ, সঙ্গে ব্যাগেটের মতো এক ধরনের স্পাইস্‌ড ব্রেড হার্ড টোস্ট করা, বিশাল এক পেট সালাদ, অলিভ আর ছোট ছোট মাইল্ড পনিরের কিউব। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার তিনি, আমি মানুষের সুন্দর ছবি তুলতে পারি না শুনে হাসলেন, 'মডেলদের ছবি দূর থেকে জুম করে তোলা ভালো। কাছে গিয়ে ইতি-উতি করলে পোজ দিতে পারে না মডেলরা। তাছাড়া জুম করলে অবজেক্ট পরিষ্কার আর আশপাশটা বের হয়, এতে করে মডেলদের ফেস কৃস্টাল ক্লিয়ার দেখায়।' সাপের লকলকে জিহ্বার ছবি তুলতে গিয়ে গোটা রিল শেষ করেও ভালো একটা স্ন্যাপ নিতে পারিনি শুনে হাসলেন। 'স্পিড কতো দিয়েছিলেন?' শাটারস্পিড পাঁচশো দিয়েছি শুনে খানিক অবাক হলেন কিন্তু যখন শুনলেন ওটা সোভিয়েত মেইড জেনিট ক্যামেরা আর তার সর্বোচ্চ স্পিড পাঁচশো তখন মুচকি হাসলেন। 'ওটা আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম, কাস্ট আয়রনের বডি, ওজন এক কেজিরও বেশি।' এবার হো হো করে হেসে ফেললেন। 'সোভিয়েতদের এই জিনিসটা মজার, ওরা ছোট কিছু বানাতে পারে না। সব বিশাল আর ভারী।'

পার্টি করতে ভালোবাসতেন তিনি। তাইতো যতবার লন্ডনে মরিয়ম খালার বাসায় এসেছেন, প্রত্যেকবার বার-বি-কিউ করেছেন, পেছনের বড় উঠোনে। শুধু তার জন্যই যেন মরিয়ম খালার পরিবারের সবাই অপেক্ষায় থাকতেন- তিনি আসবেন, বার-বি-কিউ পার্টি হবে। সেই সুবাদে লন্ডনে অন্যান্য কাছের মানুষেরা আসবেন। বসবে সেই আনন্দ-আড্ডা, যার মধ্যমণি শাহাদত চৌধুরী। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মৌলবাদ সহ্য করতেন না, রাজাকারদের কথা তো বাদই দিলাম। তাই বলে ধর্ম নিয়ে কুৎসা অপছন্দ করতেন দারুণ।

২০০৪-এর সামারে নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে লন্ডনে এসেছিলেন। তখন আমার বাসায় এনেছিলাম অনেক অনুরোধ করে। 'আমি কিন্তু ভাবিনি তোমাদের ঘরটা এতো সুন্দর গোছানো, পরিচ্ছন্ন দেখবো। দুইটা মাত্র ব্যাচেলর থাকো গোটা বাসায়, বেশ ভালোই রেখেছো।' ঘোড়ার ডিম, আমি আর আমার ফ্রেন্ড চোখাচুখি ভাবের আদান-প্রদান করি। কতোখানিইবা গোছানো আমরা? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একথা সত্যি। কারণ অপরিষ্কার হবার কিছু নেই, সপ্তাহে একদিন ক্লিন করলেই যথেষ্ট। কিন্তু তার প্রশংসা শেষ হয় না। ওই যে? পজিটিভ থিংকিং! রাঁধতে জানি না আমরা কেউই, তার পরও খুব আগ্রহ নিয়ে, মজা করে আমার রান্না করা কিম্ভূত খিচুড়ি, মুরগির মাংস, সালাদ, আচার ইত্যাদি দিয়ে খেলেন। অথচ ওই কিন্তু খিচুড়ি আমি রেঁধেছিলাম বুট-ডাল দিয়ে। টেলিফোনে যখন মাকে বললাম সে কথা, আম্মা তো চটে গেলেন- সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই? ওনাকে বুট-ডালের খিচুড়ি রেঁধে খাইয়েছিস? সে কথা মনে পড়লে এখন খুব খারাপ লাগে, চোখে পানি চলে আসে।

সেদিনই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দীর্ঘ গল্প হোলো আমার আর শাহাদত মামার। এ গল্প, সে গল্প, তখন তসলিমা নাসরিনের 'ক' নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। আমি তাকে তসলিমার একটা প্রবন্ধের কথা বললাম, যেখানে তিনি মুহাম্মদ সম্পর্কে যা ইচ্ছে লিখেছেন। ল্যাপটপটা হাতে নিয়ে জাকারিয়া স্বপনের ওয়েব পোর্টাল ই-মেলা সাইট থেকে 'ক'-এর পিডিএফ ফাইল ওপেন করে দিলাম। স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে পড়ে বললেন, 'একটা প্রিন্ট নাও তো আমার জন্য।' তারপর কাগজটা ভাঁজ করে কোটের পকেটে রাখলেন। সন্ধ্যায় মরিয়ম খালার পেছনের উঠোনে বরাবরের মতো বার-বি-কিউ পার্টি। খালার পরিবারের সঙ্গে আছেন বিবিসি বাংলা বিভাগের সাগর চৌধুরী, ঊর্মি খালা ও তাদের ছেলে রূপক, শাহরিয়ার কবির, তার মেয়ে মুমু, এক ডাক্তার দম্পতি এবং আরো কয়েকজন। রাতের খাবার শেষে জম্পেশ আড্ডার এক ফাঁকে পকেট থেকে প্রিন্ট করা ঐ কাগজটা বের করে ঊর্মি খালাকে দিয়ে বললেন, পড়ো। ঊর্মি খালা পড়ার আগে চোখ বুলিয়ে খানিকটা দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি পড়বো শাহাদত ভাই? 'আরে পড়ো পড়ো এখানে সবাই অ্যাডাল্ট'- বললেন তিনি। ঊর্মি খালা পড়লেন পুরোটা। তসলিমা নাসরিনের এ বিষয়ে এমন মন্তব্য তিনি দারুণ অপছন্দ করেছিলেন, 'সেই পনের/কুড়ি বছর আগে সালমান রুশদী কী লিখেছিলো, ওটাকে কপি এন্ড পেস্ট করা হয়েছে বাংলায়। সবাই ভুলে গেছে, মিডিয়াতে আবার চেহারা দেখানোর সস্তা চেষ্টা।' অন্যদিকে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টেও দারুণ। ঊর্মি খালা আর শাহরিয়ার কবিরের মৃদুমন্দ খুনসুটি যখন ঝগড়ার পর্যায়ে যাবার অবস্থা, শাহাদত মামা হঠাৎ 'হেমায়েত!' বলে খুব জোরে ডাকতে শুরু করলেন, হেমায়েত সাহেব শাহাদত মামার বোন মরিয়ম খালার হাজব্যান্ড। 'আপনি দেখছি সেই তখন থেকে চুপচাপ বাদামই চিবুচ্ছেন। এই হেমায়েত কিন্তু অনেক চালাক একটা পাবলিক। চুপ করে সব শোনে, কিছু বলে না। আসেন, সামনে আসেন।' গোটা পরিস্থিতি নিজের মতো করে নিলেন আবার, দুই বন্ধুর ঝগড়াও আর করা হলো না।

একদিকে তিনি যেমন ক্যারিশমাটিক, শিল্পী, দরদি; অন্যদিকে তার সততা এবং কাঠিন্যও ছিলো। তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগ অনেকেই নিয়েছেন, যা কি না মরিয়ম খালা এবং পরিবারের অন্যরা জানতেন, বুঝতেন। তার নাম ভাঙিয়ে অনেকেই আজ বুদ্ধিজীবীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন, আর তিনি ছিলেন সবকিছুর আড়ালে। যশের মোহ তার কোনোকালেই ছিলো না। সততার বিষয়ে তিনি ছিলেন অন্য রকম। এমনই একটা মানুষ, যিনি কি না রিকশাওয়ালাকে তুমি করে বলেননি কোনো দিন, চিৎকার-চেঁচামেচি করেননি। যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল থেকেছেন। কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে খুব কাছের মানুষের সঙ্গেও কোনো প্রকার আপস করেননি।

কবিতা হায়দার। বাংলাদেশের এক সময়ের সাড়া জাগানো বিখ্যাত পাক্ষিক আনন্দবিচিত্রায় তাঁর এক সময়কার সহসম্পাদক। ভালো নাম শাহ্‌নাজ নাজনীন কবিতা। চাকরি ছেড়ে যেতে হয়েছিলো আমেরিকায় প্রবাসী হবার কারণে। তারও বেশ ক'বছর পর শাহাদত মামা একটা চিঠি পান কানাডিয়ান কনস্যুলেট থেকে সেখানে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০/আনন্দধারা থেকে শাহনাজ নাজনীন নামের কোনো স্টাফকে স্পন্সর করেছেন কি না। হতভম্ব। শাহাদত চৌধুরী কনস্যুলেটকে বললেন, তিনি যে চিঠি দিয়েছেন তার একটা কপি ২০০০-এর অফিসে ফ্যাক্স করতে। কপি হাতে পেয়ে তিনি যতটা অবাক হয়েছেন তারচেয়ে বেশি বিস্মিত, বিমূঢ় হয়েছেন। একটা চিঠি বানিয়ে তার সিগনেচার নকল করা হয়েছে এবং সেটা করেছেন তারই এক সময়কার স্টাফ যাকে স্নেহ দিয়েছেন, শিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন, দায়িত্ব দিয়ে পরিচিত করেছেন। খুব ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। কানাডিয়ান কনস্যুলেটকে জানালেন, ঐ চিঠি বা সিগনেচার কোনোটাই তার নয়। লেখা চিঠির ধরনই আলাদা।

কথাগুলো আমাকে যখন বলছিলেন, তার ভেতর চাপা একটা ক্রোধ দেখেছিলাম। কিন্তু মানুষটি রাগ করতে পারে এটা আমার এখনো মনে হয় না।

এই বিশাল ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমি কী লিখবো? কীইবা লিখতে পারবো? এতো বড় বড় মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। এতো বড় বড় মানুষের লেখায় অলঙ্কৃত হয়েছে তারই সৃষ্ট সাপ্তাহিক ২০০০। এতোগুলো মানুষকে একসঙ্গে একা করে তিনি শেষমেশ চলে গেলেন। আর আমরা কাঁদলাম। কত্তো স্মৃতি! বারবার মনে আসছিলো... এখনো বেকার স্ট্রিট, কভেন্ট গার্ডেন, সোহো, লিস্টার স্কয়ার কিংবা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের বিশেষ কিছু জায়গায় গেলে মনে হয় শাহাদত মামা পাশে আছেন, হাঁটছেন ধীরে ধীরে সেই চিরাচরিত হাসিমুখ নিয়ে। যার সঙ্গে যতোক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ শেখা যায়। যাকে হৃদয় খুলে বলা যায় সব কথা...।

লন্ডন থেকে